International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-IV, July 2024, Page No.83-89
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i4.2024.83-89

নদিয়ার কৃষ্ণনগরের শোলাশিল্প ও শিল্পী

ড.দেবযানী ভৌমিক (চক্রবর্তী)
সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Among the many renowned art forms of Nadia's capital city Krishnanagar, a very prominent one is shola art. In the field of making adorned deities, wedding crowns et cetera, this local art is irreplaceable. The locality named Bagdipara is specifically dedicated to this art form. This art form was established by artist Manmatha Bag. The ancestors of the Bagdis worked in the Raj bari (palace). They had a water-centric life. The same water was the origin of the shola art. This art form is currently carried on by artist Prafulla Chandra Bag, Basudeb Bag, Sahadeb Bag, Goutam Bag and so on. Apart from them, Tulsi Malakar, Tarakchandra Malakar, Subrata Malakar have continued this work with full dedication. In present times, precipitation has been receeding, the shola form could not grow much. Apart from this, due to some other issues, artists have been facing discomfort. Yet with cordial love, artists have caused maximum prosperity to this art. Sholas are collected in a specific method and then adding other ingredients with them, artists gift us a great aesthetic. With this, the adornment of by post is mentionable. Rangta was collected by post from Germany. What was used with shola to make the Devi extremely beauteous, is bought from the market to save expense in today's era. However, these are not metallic pieces.
Keywords: Krishnanagar, Shola art, Water, Prominent, Germany.

শোলাশিল্পের সঙ্গেই তাঁদের বছরভর যাপন। তাঁদের নিত্যদিনের জীবনচর্যা তথা বিভিন্ন আবেগের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে শোলা। নিজেদের থেকেও শোলাকে তাঁরা উপরে রাখেন। নিচে রাখলে ইঁদুর বা অন্যান্য পোকা বাসা বাঁধলে শোলার ক্ষতি। শোলা ও সোনা তাঁদের কাছে সমার্থক। পরম যত্নে শোলাকে আগলে রাখেন তাঁরা। কারণ তাঁদের জীবন ও জীবিকা শোলা যে তাঁদের কাছে বড়ই প্রিয়। তাঁরা শোলাশিল্পের কারিগর। তাঁদের বসবাস কৃষ্ণনগরের বাগদিপাড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশিষ্ট জেলা নদিয়ার রাজধানী তথা সদর শহর কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধি বহুবিধ কারণে। সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পে পশ্চিমবঙ্গে একটি উজ্জ্বলতম স্থান এই শহরের। ভোজনরসিক অবশ্য বুঝবেন কৃষ্ণনগর মানেই সরপুরিয়া বা সরভাজার আস্বাদন। এছাড়া মাটির পুতুলের খ্যাতি তো জগৎজোড়া। দেশবিদেশের গবেষকদের কৌতূহলী পর্যবেক্ষণ এই মাটির পুতুলকে ঘিরে। তবে মাটির পুতুলের

পাশাপাশি শোলাশিল্পের উৎকর্ষতাও কৃষ্ণনগরকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। মাটির পুতুলের জন্য যেমন কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি অঞ্চল, শোলাশিল্পের জন্য তেমনই বাগদিপাড়া নির্দিষ্ট। বাগদিপাড়ায় গেলে দেখা যায় ঘরে ঘরে শিল্পীরা নিখুঁত হাতে শোলা কেটে কেটে বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করছেন৷ পরিবারের প্রায় সকল সদস্যই এতে অংশ নেন৷

বিয়ের পাত্রপাত্রীর টোপর ও মুকুট মানেই শোলাশিল্পীদের শরণাপন্ন হতেই হবে৷ দেবদেবীর অঙ্গসজ্জায়ও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় শোলা৷ বাগদিপাড়ায় একটি জনপ্রিয় নাম শিল্পীগৌতম বাগ৷ শিল্পী জানালেন যে, দেবদেবীর সজ্জা প্রকরণ দেখেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই শিল্পের প্রতি৷ দেবদেবীর সাজ তথা মণ্ডপসজ্জায় তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনা সকলকে মুগ্ধ করে৷ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে বিবাহমণ্ডপ সাজানোতেও শিল্পী গৌতম বাগের চাহিদা সার্বিকস্তরেই চোখে পড়ে৷

পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম লোকশিল্প হচ্ছে শোলা৷ শোলা মূলত জলজ উদ্ভিদ৷ যার বৈজ্ঞানিক নাম Aeschymene aspera । এটি দু'ধরণের হয়, একটি কাঠশোলা---যা খুব শক্ত, অর্থাৎ কাঠের মতো৷ অপরটি ভাটশোলা যা নরম৷ জনশ্রুতি আছে যে,পার্বতীকে বিয়ের সময় স্বয়ং মহাদেব সাদা রঙের মুকুট পরার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন।দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তখন মুকুট তৈরির উপাদানের কথা চিন্তা করতেই মহাদেবের ইচ্ছেতে জলাশয়ে এই শোলাগাছের জন্ম হয়। বিশ্বকর্মা পড়লেন মহা সমস্যায়।কারণ তিনি তো শক্তদ্রব্যে কাজ করতে অভ্যস্ত।কীভাবে এই নরম শোলা দিয়ে কিছু প্রস্তুত করবেন! ব্যবস্থা একটি হল। মহাদেবের ইচ্ছেতেই জলাশয়েই এক সুকুমার যুবকের জন্ম হল, যাকে মালাকার হিসেবে চিহ্নিত করা হল। তাই মালাকারগণ মূলত শোলাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়। তাঁরা বংশানুক্রমে শোলা দ্বারা প্রতিমার অলঙ্কার, চালচিত্র, পূজামণ্ডপের সজ্জা, মালা, বিয়ের টোপর-মুকুট থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম খেলনাও নির্মাণ করেন।

শোলা মূলত কাণ্ডসর্বস্ব গাছ৷ কাণ্ডের বাইরের আবরণটা মেটে রঙের হয়৷ ভেতরটা ধবধবে সাদা৷ গাছগুলির উচ্চতা ৫-৬ ফুট পর্যন্ত হয়৷ ব্যাস হয় ২-৩ ইঞ্চি৷ বাগদিপাড়ার শিল্পীদের কাছেই জানা গেলো যে, বৃষ্টি বেশি হলে শোলার উচ্চতা বেড়ে যায়৷ এতে ফলনও বাড়ে৷ তখন শোলাশিল্পীদের মহা আনন্দ৷ চৈত্র বৈশাখ মাসের দিকে বৃষ্টি হলে শোলা আকারেও বড় হয়, নরমও হয়৷ আবার জল কম হলে সে বছর গাছগুলির বৃদ্ধি সেভাবে হয় না, ফলে শিল্পীদের মন খারাপ হয়ে যায়৷ বর্তমানে শিল্পীদের মধ্যে হতাশাই যেন বেশি৷ কারণ বৃষ্টি কমে যাওয়া তথা সময়মতো বর্ষা না আসায় শোলার উৎপাদন কমে যাচ্ছে৷ আবার উৎপাদিত শোলা গ্রামের কিছু মানুষ গোড়া থেকে কেটে নিয়ে আসার পর দু'তিন হাত ঘুরে তা কলকাতায় চলে যায়৷ কিছু আড়তদার সেখানে শোলা মজুত রাখেন৷ সেটাই শিল্পীদের সংগ্রহ করতে হয় অধিক দামে৷ আবার সেই শোলা আনতে গিয়েও প্রভূত অর্থব্যয় হয়৷ লোকাল ট্রেনে শোলা বহন করা যায় না--- আগুন লাগলে ভয়ানক সমস্যা হতে পারে৷ অতএব কয়েকজন মিলে গাড়ি ভাড়া করে শোলা আনবার ব্যবস্থা করতে হয়৷ শিল্পীদের কাছ থেকে আর একটি বিষয়ও জানা গেলো শোলার ফলন কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে,সেটি হল--- বোরো ধানের চাষ হওয়ায় শোলার বীজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে৷ বৃষ্টি কমে যাওয়ায় শোলায় একটা লালচে ভাব চলে আসে৷ ধবধবে সাদা রংটা আর থাকছে না৷ গত তিন চার বছর যাবৎ এমন সমস্যায় শিল্পীদের কপালে ভাজ৷ গ্রামগঞ্জের যেসব মানুষ শোলার জোগান দিতেন, তাঁরা অন্যান্য ব্যবসায় যুক্ত হয়ে পড়ছেন, ফলে শোলা সংগ্রহ করাটাই বর্তমানের শিল্পীদের পক্ষে মহা চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ছে৷

শোলা সংগ্রহ করবার পর ভালো করে শুকিয়ে নেওয়া হয়৷ বৃষ্টিতে শোলার ফলন ভালো হয়, তবে শোলা শুকোনোর সময় বৃষ্টি হলে মহা সমস্যা৷ তৎক্ষণাৎ শোলা শুকনো স্থানে সরিয়ে ফেলতে হয়, নাহলে বৃষ্টির জলের ফোঁটায় শোলার উপর বিভিন্ন দাগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে৷ শোলার সাদা অংশটা দিয়েই সাধারণত কাজ হলেও অনেক সময় বিশেষ কিছু শৌখিন দ্রব্য নির্মাণে শোলার ছালটাও ব্যবহৃত হয়৷ মাছ ধরার জালের এক দিকে শোলার ব্যবহার করা হয়, জালটিকে ভাসিয়ে রাখার জন্য৷

শোলাশিল্পের উদ্ভব কোথায়, তা নিয়ে একাধিক মত থাকায় আমরা সেই বিতর্কে যাবো না। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কৃষ্ণনগরের বাগদিপাড়ার শিল্পীরা একে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। এছাড়া বনকাপাসির নামটিও উঠে আসে এ প্রসঙ্গে। এটিকে সবাই শোলাশিল্পের গ্রাম হিসেবেই চেনেন। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের বনকাপাসিও শোলাশিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই গ্রামের শিল্পকর্ম শুধু দেশেই নয় দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে পৌঁছে যাচ্ছে আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি দেশে। এখানকার বিশেষত্ব হচ্ছে শুধুই শোলা দিয়ে সম্পূর্ণ নকশা করা। এর মধ্যে তাই সাদারই প্রাধান্য। অন্য কোনও উপাদান তাঁরা ব্যবহার করেন না। কিন্তু কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মে অনেক রকম সামগ্রীই ব্যবহার করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য রং, চুমকি ইত্যাদি সহযোগে প্রতিমার অঙ্গসজ্জায় বৈচিত্র্য আনা। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের বা ক্রেতার চাহিদাও একটি বড় বিষয়। কৃষ্ণনগরের শিল্পীরাই ভাঙলেন বনকাপাসির ধরনটা। এলো এক নতুন রূপ এই শোলাশিল্পে।

নানাবিধ উপকরণ ব্যবহৃত হতে থাকে৷ যেমন জড়ি বা রাংতা বিভিন্ন রকম রঙের ব্যবহার করেন৷ শিল্পী গৌতম বাগ জামিরের চুমকির কথাও জানিয়েছেন৷ জার্মান থেকে আসত তাই নাম জামির৷ বর্তমানে এত অর্থমূল্যে ক্রয় করা সম্ভব হয় না বলে আসল জামিরের চুমকির বদলে বাজারজাত তুলনামূলক সস্তা চুমকিতেই কাজ সারেন শিল্পীরা৷ এগুলির বিভিন্ন আকার৷ খুব বেশি বড় না হলেও আকারে লম্বা, গোল, হৃদয়ের মতো বা হরতনের মতো হয়ে থাকে৷ চুমকিগুলিকে কেটে কেটে আঠা দিয়ে লাগানো হয়৷ এরপর ফাঁকা স্থানগুলিতে রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়৷ সাধারণত জলে গোলা রঙেরই ব্যবহার করা হয়৷ আগে অভ্র ব্যবহার করা হত৷ বর্তমানে আর্থিক কারণেই এক্ষেত্রেও নকলের উপরেই ভরসা করতে হয় শিল্পীদের৷ প্লাস্টিকের চুমকি তথা গুঁড়ো দিয়েই কাজ চালান শিল্পীরা, যদিও এতে তাঁদের মনের সমর্থন থাকে না৷ কারণ প্লাস্টিকে পরিবেশ দূষিত হয়৷ কাজেই বিতর্কিত প্রশ্নের মুখে তাঁদেরও পড়তে হয়৷ শিল্পীদের আরও একটি আক্ষেপ, শোলার বদলে অর্থসংকুলানের তাগিদে থার্মোকলেও কাজ সারতে হয়!

আমরা শোলার সাজের পাশাপাশি ডাকের সাজ কথাটির সঙ্গেও বিশেষভাবে পরিচিত৷ দেবীর সজ্জায় যা অনন্য৷ দেবীর ড্যাবড্যাবে চোখ, তাঁর পেছনদিকে মস্ত চালচিত্র, অঙ্গে শোলার সাজ---এটাই বোধ হয় আমাদের সকলের পছন্দ৷ ব্রিটিশ আমলে জার্মানি থেকে আমদানি করা হত রাংতা, যা দিয়ে প্রতিমাকে অলঙ্কৃত করা হত৷ রাংতাটি ডাকযোগে আসত তাই এহেন সরঞ্জামের নামই হয়ে গেলো ডাকের সাজ৷ অর্থাৎ শোলার সঙ্গেই রাংতার প্রয়োগ ঘটিয়ে দেবীর অঙ্গসজ্জায় অধিকতর বৈচিত্র্য ঘটানোর চেষ্টা৷ যা ছিল সম্পূর্ণত মেটাল বা ধাতব পাত৷ যা থেকে প্রয়োজনমতো কেটে কেটে অলঙ্করণ করা হত৷

শোলা যেমন প্রতিমার অঙ্গসজ্জা থেকে শুরু করে মাছ ধরার জালের কাঠিতে ব্যবহৃত হত তেমনই শোলা আর একটি বিশেষ কাজেও ব্যবহার করা হয়েছে। সেটি হল ব্রিটিশ সেনারা তাঁদের মাথার টুপির ভেতরে শোলা রাখতেন। আসলে শোলায় তাপ সরবরাহ হয় না ফলে ঠাণ্ডা থাকে। Heat proof বা

insulator -এর কাজ করে শোলা। এছাড়া শোলা অনেক দিন ঠিক থাকে। স্থায়িত্ব বেশি হওয়ায় এর তৈরি সামগ্রীর চাহিদাও বেশি। সবচেয়ে বড় বিষয় শোলা সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত। বর্ষাকালে যখন বিলটা ভরে যায় শোলাশিল্পীদের আনন্দ বাঁধা মানে না। শীতে শোলার সারা গায়ে লোম, দেহটাকে ভাসিয়ে রাখতে সুবিধে হয় এতে। এর মাধ্যমে অক্সিজেন আদানপ্রদান হয়। প্রকৃতির এক অপূর্ব দান এই শোলা গাছ।

শোলাশিল্পে কিছু বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, ---যেগুলির সাহায্যে শোলা থেকে বিভিন্ন সামগ্রী গড়ে ওঠে। যদিও সেগুলি সংখ্যায় খুব একটা বেশি নয়। তবে এক্ষেত্রে সেই সব যন্ত্রপাতি অপরিহার্য।যেমন---

(১) কাঁচি--- যা দিয়ে শোলা কাটা হয়। বিশেষ ধরণের কাঁচির ব্যবহারে শোলা তথা কাগজ কাটা হয়।
(২) কাত--- এটি বিশেষ ধরণের ছুরি। যার একদিকে ধার আছে, অন্যদিকে নেই। শোলার গা থেকে ছালের আস্তরণটা কেটে বাদ দিয়ে ভেতরের সাদা অংশটা বের করে আনতেই কাতের ব্যবহার।
(৩) সরু কাত---এটির আবার দু'দিকেই ধারালো। মুখটি হয় ছুঁচলো।
(৪) ঠোকনা বা টুকনা----সম্পূর্ণ লোহানির্মিত এই যন্ত্রটির সাহায্যে চুমকি কাটা হয়।
(৫) গোখরি ভাজা কল---এই যন্ত্রে, এক ধরণের চকচকে কাগজ যাকে শিল্পীরা বলেন বসমা, তা থেকে সরু সরু ফালি কেটে নিয়ে লম্বা ফিতের মতো অংশগুলিকে ঢুকিয়ে কুচি দেওয়ার মতো করা হয়। ভাজা শব্দটি আসলে ভাজ থেকে এসেছে। ওই বিশেষ চকচকে ফালি করা কাগজটিই হল গোখরি।

শোলাশিল্পের পূর্ণাঙ্গতার জন্য বেশ কিছু সামগ্রীর ব্যবহার করেন কৃষ্ণনগরের বাগদিপাড়ার শিল্পীরা। মূল উপাদান শোলা হলেও আনুষঙ্গিক কিছু উপাদান তাই এসেই পড়ে। যেমন,---

(১) বসমা--- এটি হল ফয়েলের একটি ধরন। একদিকে রঙিন চকচকে অন্যদিকে সাদা। এই কাগজগুলি বিভিন্ন রঙের হয়। যেগুলি প্রয়োজনমতো শিল্পীরা নকশা এঁকে কেটে নেন।
(২) জামির--- যদিও এখন এটি নেই। কারণ জার্মান থেকে আর এহেন ধাতবপাত আমদানি করা হয় না। বর্তমানে তাই এক ধরণের প্লাস্টিকের উপাদান দিয়েই কাজ সম্পন্ন করতে হয়।
(৩) আঠা--- ময়দা ও তুঁত জল দিয়ে গুলে একটা মণ্ড তৈরি করে সেটিকে জ্বাল দিয়ে আঠা প্রস্তুত করা হয়। পোকা যাতে না লাগে সেজন্যই এহেন আঠার প্রয়োগ। দীর্ঘদিন ধরে সামগ্রীগুলি এতে অক্ষত থাকে।
(৪) কড়ি--- এটি এক ধরণের প্লাস্টিকের সামগ্রী। এটিও মূলত ব্যবসায়িক স্বার্থেই সৌন্দর্যায়ন ঘটাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত সাদা রঙের হয়। কিছুটা ডিম্বাকৃতির কিন্তু মুখটা ছুঁচলো মতো।
(৫) কড়ি----সাদা কাগজ ও টিস্যু পেপার, বর্ধমানের বনকাপাসিতে সাদা কাগজ বা টিস্যুর উপর শোলা দিয়ে কাজ করা হয়। কৃষ্ণনগরে টিস্যুর উপর রাংতা বা জড়ি দিয়ে কাজ করা হয়।
(৬) চুমকি---বাজার চলতি প্লাস্টিকের চুমকিরও প্রচলন রয়েছে এখানে। পূর্বে যা ছিল জামিরের চুমকি।
(৭) থার্মোকল---এটি মূলত Synthetic Polymer, অর্থাৎ এও এক ধরণের প্লাস্টিক। পর্যাপ্ত শোলার অভাবেই এর প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে কিছুক্ষেত্রে। যদিও শিল্পীদের কাছে মূল উপাদান শোলাই। এছাড়া, জড়ি বা জড়ির ফিতে, ভেলভেড পেপার, বিভিন্ন রকম রং, ইত্যাদিরও ব্যবহার করা হয় এই শিল্পকর্মে।

দুর্গাপুজো, কালিপুজো,জগদ্ধাত্রী পুজো, লক্ষ্মীপুজো কিংবা সরস্বতী পুজোতে তো বটেই, বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও বাগদিপাড়ার শিল্পীদের বায়না করা হয়। প্রতিমার অঙ্গসজ্জায় নানাবিধ শোলার অলঙ্কার প্রতিমাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। চাকচিক্য বাড়াতে কিছু জিনিস বাইরে থেকে ব্যবহৃত হলেও শিল্পীদের মূল লক্ষ্য শোলা। শোলাকে বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে আকার দিয়ে সেসব

টুকরো দিয়ে প্রতিমার অঙ্গসজ্জা করা হয়। অধিকতর ঝলমলে করে তুলতেই শোলা ও ডাক এক সঙ্গে মিশিয়ে কাজ করেন শিল্পীরা৷ উল্লেখ করা যাক সেইসকল বিশেষ আকারের শোলাগুলির---

(১) কুশি---এর আবার বিভিন্ন প্রকার থাকে। যেমন---ডিম্বাকৃতি, ত্রিভুজ, আমপাতা, বাঁশপাতা বা কখনও হৃদয়াকৃতির।
(২) নিমকি---এর আঞ্চলিক নাম ক্যাঁচা। এরও বিভিন্ন আকার হয়।
(৩) গুলো বা ত্রিশিরা---শোলা বিশেষভাবে কাটা হয়। যার তিনটে শির রয়েছে। স্থানীয় ভাষায় একে তেশিরাও বলা হয়। এর আর একটি ধরন হল পাতুরি। যার শিরা নেই।
(৪) পাতি---এগুলি গোল করে কাটা শোলা। ছোট বড় মাঝারি বিভিন্ন আকারের হয় এগুলি।
(৫) ঢ্যাপ---- এটি একটি আঞ্চলিক নাম। অন্য নাম ট্যাবলেট। স্থানভেদে এর ভিন্নতর নামকরণও হতে পারে।
(৬) কাঁকড়া বা চরণ--- অনেকটা বিষ্ণুর চক্রের মতো শোলা কাটা হয়। এর অপর নাম তাই চক্র।
(৭) দাঁত বা করাত---লম্বা করে কাটা। লম্বা ব্যাপারটা না থাকলে তো সাজটাই হয় না। এটি পাতুরির একটা অংশ।
(৮) দাঁত বা কুশি---কুশির ধারগুলো দাঁতের মতো করে কাটা হয়। এরও বিভিন্ন আকার হয়।
(৯) আঁশ---শোলাকে খুবই পাতলা করে কাটা হয়। সাধারণত গোল আকৃতির হয়।

কিছু বিষয় দিয়ে প্রতিমার চালচিত্র থেকে শুরু করে অঙ্গসজ্জায়ও অলঙ্করণ ঘটানো হয়। দেবীর সর্ব শরীরের গহনা থেকে বস্ত্রের আঁচল পর্যন্ত তথা ভেতরের জমির অলঙ্করণেও শোলার প্রয়োগ এক অনবদ্য সৌন্দর্য রচনা করে। এখন সেই অংশগুলির উল্লেখ করা যাক---

(১) চালচিত্রের কাঠামো---এটি মূলত বাঁশ দিয়ে বানানো হয়। তারপর এর উপর শিল্পী তাঁর সৃজনশীলতার প্রলেপ দেন। বাঁশের ফালি তৈরি করে বা বাঁশের চটা বিশেষ পদ্ধতিতে সাজিয়ে সুতলি দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এর বিভিন্ন আকার।
(২) চালচিত্র---প্রতিমার পেছনদিকে এই চালচিত্র শোভা পায়। শোলা দিয়ে তা অনিন্দ্যসুন্দর করে তোলেন শিল্পী। এতে পটচিত্র আঁকা থাকতো বলে নামকরণ হয়েছিল চালচিত্র।
(৩) মুকুট---মুকুট বা কিরীট প্রতিমার মাথার উপরে থাকে। যা ছাড়া সজ্জা অসম্পূর্ণ।
(৪) খুন্তি---মুকুটের দুটি অংশ। উপরের অংশটি খুন্তি বা খোন্তা। দুটি অংশ মিলিয়েই মুকুট।
(৫) কানের গহনা----প্রতিমার কানের অলঙ্কার খুবই জরুরি। তা অনেকরকম রূপেই নির্মাণ করেন শিল্পীরা। এর বিভিন্ন ধরনগুলি হল---কানপাশা, চৌদানি ইত্যাদি।
(৬) বাজুবন্ধ---প্রতিমার হাত বা বাহুর অলঙ্করণে এই গহনা ব্যবহৃত হয়। এটি বাহুর ঊর্ধ্বদেশে পরানো হয়।
(৭) চুড়ি---হাতের গহনা তো খুবই জরুরি। হাতে চুড়ি ছাড়া তো দেবীর সাজই অসম্পূর্ণ।
(৮) বুকের গহনা---প্রতিমার বক্ষদেশের অলঙ্করণে বেশ বৈচিত্র্যবিধায়ক শিল্পকর্ম লক্ষণীয়।এছাড়াও আর এক ধরনের বুকের গহনা পুঁতি বা জড়ির ফিতের সঙ্গে ঝোলানো হয়। আবার লকেটও ব্যবহৃত হয়।
(৯) আঁচল---প্রতিমার অঙ্গের শাড়ির আঁচলে অনবদ্য অলঙ্করণ ঘটানো হয় শোলার সাহায্যে।

(১০) কাপড়ের বুটি----অঙ্গের শাড়িটি হয় অবশ্যই সাটিন বা রেশমি। তার উপরে নকশাদার বুটি বা ফুল শাড়িগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

প্রতিমার অঙ্গসজ্জায় এই সকল গহনার পাশাপাশি আরও কিছু ব্যবহৃত হয়। যেমন হাতের কিছু বিশেষ গহনা---শাখা, রতনচূড়, আংটি ইত্যাদি। এছাড়া ব্যবহৃত হয় মাথার টিকলি, গলার চিক আরও অসংখ্য অলঙ্কার। ব্যবসায়িক স্বার্থে শিল্পীরা অন্য উপাদান ব্যবহার করেন। সেক্ষেত্রে চাকচিক্য বা জৌলুস বাড়াতে কিছু জিনিস ব্যবহৃত হলেও শিল্পীদের মূল লক্ষ্য কিন্তু শোলা। শোলা নিয়েই তাঁদের যত আবেগ। ঝলমলে করে তোলার উদ্দেশ্যেই শোলা ও ডাক একসঙ্গে মিশিয়ে কাজ করেন শিল্পীরা।

কৃষ্ণনগরের বাগদিপাড়ার শিল্পীদের এই শোলাশিল্পে আসার কারণ অনুসন্ধানে কিছু বিষয় জানা গেলো৷ বর্তমানে তাঁদের পঞ্চাশ-ষাট ঘর৷ তাঁদের পূর্বপুরুষরা কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে কাজ করতেন৷ তাঁরা রাজবাড়ির পরিখা খনন বা সেটি দেখাশোনা করতেন৷ এরই সঙ্গে পশুপালন, জালবোনা, মাছের চাষ, দড়ি তৈরি করা ইত্যাদি কাজ৷ অর্থাৎ জলকেন্দ্রিক জীবন ছিল তাঁদের৷ কারণ বেশির ভাগ কাজই পুকুর -নদী-জলাভূমিকে কেন্দ্র করে৷সেই জলাভূমিই আবার শোলার উৎসস্থল৷ প্রথমদিকে শোলার ব্যবহার জালকাঠি হিসেবে করতেন তাঁরা৷ অর্থাৎ শোলাকে গুচ্ছ করে বেঁধে জালকাঠি হিসেবে ব্যবহার---যার ফলে জালের একটা দিক ভেসে থাকতে পারে৷ এই বাগদিরা জাতিগতভাবে নিম্নশ্রেণির৷ ফলে তাঁদের বসবাসের জন্য স্বতন্ত্রভাবে এই অঞ্চলটি দিয়েছিলেন মহারাজ৷ তাঁরা জঙ্গল কেটে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন৷ এই শিল্পে তাঁদের মধ্যে যিনি প্রাচীনতম, তিনি হলেন শিল্পী মন্মথ বাগ৷ তাঁর বাবা রাজবাড়ির চামর দোলাতেন৷ বাগদিদের প্রতি মহারাজা এতটাই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য এই পাড়াতেই জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন করেছিলেন৷

বর্তমানে শিল্পী মন্মথ বাগের প্রতিষ্ঠা করা শোলাশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর উত্তরসূরিরা৷ বাগদিপাড়ায় দেখা মিললো তাঁর তিন পুত্র, যথাক্রমে প্রফুল্লচন্দ্র বাগ, বাসুদেব বাগ ও সহদেব বাগের। তাঁদের সন্তান এবং তৃতীয় প্রজন্মও এই শিল্পের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছেন। প্রফুল্লচন্দ্র বাগের বয়স ৮৯। এখনও এই শিল্পের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় সৃষ্টিকর্মে মগ্ন হয়ে থাকেন তিনি। এই শোলাশিল্পীদের অনেকেই অন্য পেশায় যুক্ত হয়ে গেলেও শিল্পের প্রতি অনুরাগে এই কাজটিও চালিয়ে যাচ্ছেন৷ তবে প্রায় আট দশটি ঘর শুধুমাত্র এই শিল্পের উপর নির্ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। সমস্ত কৃষ্ণনগর তো বটেই জেলাতেও অধিকাংশ শোলার সামগ্রী এই অঞ্চল থেকেই যায়। আবার বিদেশেও যায়।

জল যত বাড়বে শোলা তত মোটা হবে, লম্বা হবে। জল কম হওয়ায় শোলার আকার সরু হয়ে যাচ্ছে। শিল্পীদের মধ্যে এ নিয়ে আক্ষেপের শেষ নেই। সূক্ষ্ম হাতে অতি সন্তর্পণে শোলার কাজ করতে হয়। বিশেষত শোলা কাটার সময়। একটু অন্যমনস্ক হলেই শিল্পীর আঙুল কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা। মরশুমের সময় শিল্পীদের স্নান ঘুম খাওয়া কোনওটিই ঠিকমতো হয় না। তবুও সৃষ্টির আনন্দে বিভোর শিল্পীরা সেসবে ভ্রুক্ষেপ করেন না। কিন্তু উপযুক্ত সম্মানদক্ষিণা তাঁরা সবসময় পান না। এটা একটা কষ্টের বিষয়। বিশেষত সরস্বতী পুজোর সময় হঠাৎ জেগে ওঠা ক্লাবের পুজোয়, পুজো মিটে গেলেও শিল্পীরা তাঁদের মূল্য পান না। এমনকি তাঁদের ইচ্ছেমতন সামগ্রী জোগান দেওয়ার পরেও এমনটা হয়।

বাগদিপাড়ায় অবশ্য কয়েক ঘর মালাকারও আছেন৷ তাঁদের মধ্যে তুলসী মালাকার যথেষ্ট বর্ষীয়ান৷ প্রতিমা কাঠামো তিনি এখনও একাই বানাতে পারেন। তাঁর ভাগ্নে সুফল মালাকার তিনিও একজন গুণী

শিল্পী ছিলেন। তিনি কয়েক বছর হল পৃথিবী ত্যাগ করেছেন। তাঁর দুই ছেলে তারকচন্দ্র মালাকার ও সুব্রত মালাকার এখন এই শিল্পেই আত্মনিয়োগ করেছেন।তারকবাবুতো বিভিন্ন সুপ্রচারিত সংবাদপত্রে এই শিল্প নিয়ে লেখালেখিও করেন। আর একটি মালাকার পরিবারও রয়েছে। শিল্পী চাঁদগোপাল মালাকারও বেশ জনপ্রিয় একটি নাম।

মালাকারেরা মূলত ডাকের সাজের শিল্পী৷ সুফল মালাকার একজন উচ্চগুণসম্পন্ন সাজশিল্পী ছিলেন। ডাকে আসা ধাতব পাত দিয়েই তিনি কাজ করতেন। তামার উপর নিকেল করা তাঁর শিল্পকর্ম। এটিই আসল ডাকের সাজ, আমরা পূর্বে যাকে জামির বলেছি। আগে শোলা দিয়ে এক ধরনের কাগজ তৈরি করা হত। তার ওপরে তুলি দিয়ে আঠা লাগিয়ে দেওয়া হত। তারপর ওই কাগজটির ওপরে ডাকের সাজের কাজ হত। আবার সেই আঠাটি তৈরি হত বিরজা নামক এক ধরনের গাছের নির্যাসের সঙ্গে মৌমাছির মোম মিশিয়ে।

কৃষ্ণনগরের বাগদিপাড়ার শোলাশিল্পের আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য বর্তমান প্রজন্মের শিল্পী গৌতম বাগ৷ মন্মথ বাগই তাঁর প্রেরণা৷ তিনি কর্মসূত্রে স্কুলশিক্ষক, কিন্তু শোলাশিল্পে তাঁর অফুরান উৎসাহ, যা উদ্ভাবনী শক্তিগুণে উত্তরোত্তর এই শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে৷ তিনি এই মুহূর্তে একটি নিজস্ব ঘরানা গড়ে তুলেছেন৷ তাঁর অনন্যতা এখানেই যে, তিনি শোলা খোদাই করে অসামান্য সব মূর্তি গড়ে তোলেন৷ ওড়িশি নৃত্য তথা বিবাহের জন্য বিশেষ মুকুটটিও তিনি তৈরি করেন নিখুঁত দক্ষতায়৷ তাঁর মৌলিক ভাবনা থেকেই জন্ম নিচ্ছে বিভিন্ন অসাধারণ মূর্তি।তাঁর তৈরি শোলার প্রতিমা পাড়ি দিচ্ছে বিদেশেও।শোলার মধ্যে লুকিয়ে থাকা মূর্তিটিকে তিনি মুক্ত করেন বাড়তি শোলাগুলিকে ফেলে দিয়ে---এটাই তো খোদাই। এক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেন এক ধরনের ছুরি।যা শ'মিলের ব্লেডকে শানকলে গিয়ে শান দিয়ে বানানো হয়। তিনি মূলত ব্যবহার করেন ছুরি,শর্ণা, আঠা ইত্যাদি। কৃষ্ণনগরের শোলাশিল্পে আধুনিকতা এসেছে শিল্পী গৌতম বাগের মাধ্যমেই। শিল্পী মন্মথ বাগ যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শিল্পী গৌতম বাগ তাকেই নিখুঁত সৃজনশীলতায় বজায় রেখে যথার্থ পারম্পর্য বহন করে চলেছেন। একথা সত্যিই যে কৃষ্ণনগরের শোলাশিল্প যোগ্য শিল্পীদের হাতের ছোঁওয়ায় লোকশিল্পের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

তথ্যসূত্র:

১) শ্রীগৌতম বাগ।